খয়রাতি

ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন লীলাবতী। অদ্ভুত একটা ঘোর লাগা ভাব, সারা শরীর মন জুড়ে জড়তার আমেজ। চোখ খোলার পরও সে ভাবটা পুরোপুরি গেল না।

প্রথমতঃ শোবার ঘরে না শুয়ে উনি স্টাডিরুমের অপরিসর দিবানে কেন শুয়ে আছেন সেই প্রশ্নটা মনে জাগলো। ওঁর ছেলে খয়রাতি ওঁকে ধরে ধরে অতি কষ্টে এ ঘরে এনে শুইয়ে দিলো। ভারী শরীর। বহু বছর আর্থরাইটিসে ভুগে প্রায় উত্থানশক্তি রহিত। অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না। শোবার ঘর থেকে তুলে ওঁকে এঘরে এনে শোয়াতে কম ঝক্কি হয়নি খয়রাতির। কিন্তু কেন? খয়রাতি বলেছিল ও-ই আজ ওঘরে শোবে এ.সি. চালিয়ে। ওর নাকি শরীর ভাল নেই। হঠাৎ খুব গরম লাগছে এই অক্টোবরের হালকা শীতের আমেজ মাখা রাতেও। আরও একটা শোবার ঘর আছে বাড়িতে, এ.সি. সমেত। তবে সে ঘরখানা বহু দিন অব্যবহৃত পড়ে আছে। খয়রাতি এলে স্টাডিরুমের দিবানেই শোয়, সে ঘরে না শুয়ে। ও নাকি অনেক রাত অবধি স্টাডিরুমে বসে বই পড়ে, তারপর ঘুম পেলে ওঘরেই দিবানটার উপর শুয়ে পড়ে।

বাড়িতে যতদিন ছিল তাঁদের কাছে, লেখাপড়া সংক্রান্ত ও লেখাপড়ার বাইরেও যে কোনও প্রকারের বইপত্তরের প্রতি খয়রাতির ঢালাও বিমুখতা তার বাবা-মা'র গভীর দুঃখ ও হতাশার কারণ ছিল বরাবর। রাজধানীর এক নামী কলেজে অধ্যাপনা করতেন ওমপ্রকাশ। পড়াশোনার জগতেই কেটেছে তাঁর জীবন। পড়াশোনা তাঁর পেশা শুধু নয়, দারুণ নেশাও ছিল।

লীলাবতী রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্কুলের গণ্ডি পার হবার আগেই। বিয়ের পর স্বামীর নির্দেশনায় আবার বিদ্যাদেবীর আরাধনা শুরু করলেন। সংসারের নানান কাজের মাঝেও কিছুটা সময় বই পড়তেন প্রতিদিন। হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্যের অনেক বই-ই পড়েছেন তিনি। আবার স্বামীর প্ররোচনায় কখনো কখনো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা বই-ও পড়েছেন। পড়ে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন তা নিয়ে।

তাঁদের একমাত্র সন্তান খয়রাতির একেবারেই লেখাপড়া হল না। ঘষটে ঘষটে ক্লাস এইটে উঠে সেখানেই মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে রইলো ঝাড়া তিন বছর। তারপর একসময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলো। সেই ছেলের হঠাৎ বই পড়ার এই তীব্র নেশা লীলাবতীর নিঃস্পৃহ মুহ্যমান মনে আঁচড়ও কাটলো না। না, লীলাবতী এ-নিয়ে কোন প্রশ্ন ছেলেকে করেননি। পারতপক্ষে কোনও প্রশ্নই কাউকে করেন না আজকাল। খয়রাতি যখন এক গ্লাস দুধ এনে ওঁর হাতে দিয়ে বললো, "খেয়ে নাও মা, ভাল ঘুম হবে," তখনও নির্বাক দুধটুকু খেয়ে নিলেন কোনও প্রশ্ন না করে যদিও দুধে মেশানো জিনিসটার স্বাদ বা গন্ধ কোনটাই ভাল লাগেনি তাঁর।

তাঁর স্বামী ওমপ্রকাশ চলে যাবার পর থেকে সংসারের কোন কিছু সম্বন্ধেই বিন্দুমাত্র কৌতূহল, উৎসুকতা, আগ্রহ বা আকর্ষণ অনুভব করেন না লীলাবতী। এ যেন একটা খোলস বয়ে বেড়াচ্ছেন, সারবান কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তাতে। ওমপ্রকাশ চিরকাল সুস্থ সবল প্রাণবন্ত ছিলেন। লীলাবতীই প্রায়শঃ ভুগতেন কোন না কোন ব্যাধি-ব্যারামে। ওমপ্রকাশের আদর যত্নে অসুস্থতাও যেন উপভোগ্য বলে মনে হত তাঁর। তিনি মনে মনে ধরেই নিয়েছিলেন জীবনটা এভাবেই কাটবে। স্বামীকে পাশে নিয়ে, স্বামীর হাতে নিজের সর্ব শুভাশুভ সঁপে দিয়ে, নিশ্চিন্ত আরামে।

ওমপ্রকাশ যেদিন ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতে হঠাৎ কোলাপ্স করলেন - ছোটাছুটি করে হাসপাতালে এনেও বাঁচানো গেল না, ডাক্তাররা বললেন খেলার প্রাঙ্গণেই তিনি মারা গেছেন, হাসপাতালে যেতে দেরী হল বলে ক্ষোভ নিরর্থক - লীলাবতী যেন সেদিন থেকে একটা পাথরের প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। এরকমটা যে হতে পারে তা কোনদিন কল্পনা করেননি তিনি। স্বামী তাঁর আজীবনের আশ্রয়। এভাবে তাঁকে পথে নামিয়ে দিয়ে স্বামী চলে যাবেন - এ যেন এক দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা। স্বামীর প্রতি অভিমানে আরও যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন লীলাবতী।

মাঝে মাঝে লীলাবতীর মনে হয় ওমপ্রকাশ হয়তো জানতেন এরকমটা হতে পারে। গত চার পাঁচ বছর তাই উঠে পড়ে লেগেছিলেন লীলাবতীকে সর্বপ্রকারে স্বাবলম্বী করার কাজে। জরুরী দলিলপত্রের কাজ সব লীলাবতীকে সামনে বসিয়ে করতেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে বলতেন কোনটার কি কর্মপদ্ধতি। লীলাবতীকে দিয়ে ব্যাঙ্কের চেকে সই করাতেন, জল-বিজলী-টেলিফোনের বিল

ভরাতেন।

আর একটা কথা ইদানীং প্রায়ই বলতেন ওমপ্রকাশ। বলতেন দুষ্ট ক্ষতকে পুষে রাখতে নেই। দুষ্ট অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়াতেই মঙ্গল, তা সে যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন। ওমপ্রকাশ জানতেন খয়রাতিকে ত্যাজ্যপুত্র করায় লীলাবতীর অন্তঃকরণ ফেটে চৌচির হয়ে গেছিল। অথচ এছাড়া আর উপায় ছিল না তা লীলাবতীও বুঝেছিলেন। খয়রাতির দুর্ভাষী, দুর্বিনীতা বউ যখনই শ্বশুরালয়ে আসতো, অল্প কদিনেই এদের শান্ত সুখী পরিবারে তুলকালাম মচিয়ে দিতো। এরপর ক্রমে ক্রমে খয়রাতির শ্বশুরবাড়ির লোকেদের প্রকৃত পরিচয়, স্বভাব চরিত্র ও মনোভাব প্রকাশ পেতে লাগলো। এঁরা মর্মে মর্মে বুঝলেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অসম্ভব। খয়রাতি তার শশুরালয়ে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নিলো এবং তাদের ছত্রছায়ায় বসে অতি দ্রুত নিজের আজীবনের শিক্ষা দীক্ষা মূল্যবোধ ছেড়ে নানাবিধ অসাধু ক্রিয়াকলাপ ধরন ধারণ আয়ত্ত করলো।

ওমপ্রকাশ স্ত্রীকে বলতেন, ভ্যাম্পায়ারের গল্প পড়েছো তো? ভ্যাম্পায়ার যাকে গ্রাস করে সে শুধু মরেই যায় না, ভ্যাম্পায়ার হয়ে মানুষ মেরে বেড়ায়। তোমার ছেলেকেও ভ্যাম্পায়ারে নিয়েছে। আমরা যে শুধু তাকে হারিয়েছি তাই নয়, সে এখন একটা অসৎ মানুষ, অসৎ উপায়ে টাকা কামানোর ধান্ধায় ঘুরছে। ওমপ্রকাশের ভয় ছিল তাঁর অবর্তমানে সে হয়তো তার অসহায় মাকে ঠকিয়ে টাকা হাতানোর চেষ্টা করবে। তাই উঠে পড়ে লীলাবতীকে সর্ব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করে গেছেন যতটা সম্ভব। বাড়িটাও ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে রেখে গেছেন ছেলে যাতে সেটা আত্মসাৎ না করতে পারে। লীলাবতীর স্বামীর উপর অভিমান, এতই যখন জানতেন তবে উঠে পড়ে নিজের স্বাস্থ্য রক্ষায় লাগেননি কেন? তাহলে তো এভাবে লীলাবতীকে একা ফেলে আগে ভাগে চলে যেতে হত না!

স্বামীকে হারানোর পর লীলাবতীর অন্তর যেন একটা জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। সব কিছুই সমান মূল্যহীন নিরর্থক তাঁর কাছে। তাই ওমপ্রকাশের দেহত্যাগের কিছুদিন পর খয়রাতি এসে যখন খুব হাউ-হাউ করে কাঁদলো, উনি কিছুই বললেন না। রাগ - দুঃখ - ভৎর্সনা কোন আবেগই প্রকাশ পেলো না তাঁর ব্যবহারে। খয়রাতি কি আশা করে এসেছিল সে-ই জানে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করলেন না লীলাবতী। বলতে কি, তাঁর নিজের মনেও কোন কৌতূহল জাগেনি। পুরো ব্যাপারটা শ্বশুরবাড়ির প্ররোচনায় সাজানো নাটক কিনা

এবং এর পিছনে গূঢ় এবং বিপজ্জনক কোনও ষড়যন্ত্র আছে কিনা তা নিয়েও মাথা ঘামালেন না আর।

খয়রাতি দিন কয়েক মায়ের কাছে কাটিয়ে চলে গেল। এরপর মাঝে মাঝেই এ-বাড়িতে পদার্পণ ঘটতে লাগলো তার। আসতো, কয়েকদিন থাকতো, আবার চলে যেতো। খয়রাতি এখন কোথায় থাকে, কি কাজ করে, এসব কিছুই জানেন না লীলাবতী। জানতেও চান না। ওমপ্রকাশের নির্দেশমত অবশ্যপালনীয় কাজগুলি করে যান। পুরোনো কাজের লোকেরা বাড়ির কাজকর্ম করে, এক তলায় বাড়ির লাগোয়া সারভেন্টস্ কোয়ার্টারে থাকে। এইভাবে দিন যায়, মাস যায়। বছর ঘুরতে চলেছে প্রায়।

লীলাবতী বহু বছর ধরে হাঁটু নিয়ে ভুগছেন। ওঁর হাড়-গোড়ও পলকা হয়ে গেছে। খুব সাবধানে হাঁটাচলা করতে হয়, পদে পদে হাড় ভাঙার সম্ভাবনা। বিখ্যাত অর্থোপিডিস্ট ডঃ খান্দেলওয়ালের চিকিৎসায় আছেন। প্রতিদিন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাড়িতে এসে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যায় তাঁকে। অন্তত এক বছর ধরে দিতে হবে এই ইন্‌জেক্‌শন।

- ২ -

দিন কয়েক আগে খয়রাতির বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে এই কথাই আলোচনা হচ্ছিল। খুব সাজানো গোছানো ড্রয়িংরুম। দামী দামী চোখ- ধাঁধানো আসবাবপত্র চারিদিকে। দেখে কে বলবে এ বাড়ির বাসিন্দারা আয়ের দিক থেকে প্রায় নিম্ন-মধ্যবিত্তই, তার বেশী নয়। উপার্জন বলতে খয়রাতিলালের টেলিফোন-বুথ ও তার স্ত্রী বেলার বিউটি পারলার। সাধারণ সাদা-মাটা জীবনধারায় টেনেটুনে চলে যায়, কিন্তু মেকি আভিজাত্যের উগ্র জাঁকজমকের খাঁই মেটেনা। তাই স্ত্রী ও শাশুড়ির পরামর্শে এখানে ওখানে দাঁও মারার ফন্দি ফিকির খুঁজে বেড়ায় খয়রাতিলাল। কিন্তু এযাবৎ খুব একটা কার্যকরী হয়নি কোনটাই। সেই বড় বড় ভাবী দাঁও-এর প্রত্যাশায় ব্যাঙ্ক থেকে চড়া সুদে ধার নিয়েছে প্রচুর। ওদের গোটা জীবনযাত্রা ঋণের টাকার উপর দাঁড়িয়ে ---- গাড়ি, বাড়ি, দামী পোশাক আশাক, ছেলেমেয়ের নামী দামী ইস্কুলের ফি ----। ব্যাঙ্কের লোন ফেরৎ দেবার কোনই সুরাহা হয়নি এযাবৎ। এরপর কি যে হবে সেই দুশ্চিন্তার বোঝা আরও গুরুভার হয়ে উঠছে প্রতিদিন। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের কোন পথই খুঁজে পায় না

খয়রাতি। মনে মনে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে ----।

"তোর শাশুড়ি মাগী মরেও মরে না। স্বামীটা চলে গেল, নিজের হাঁটাচলা বন্ধ - এরকম বেঁচে থেকে লাভ কি? মধ্যে থেকে বাড়িটা আটকে বসে আছে। মাগী মরলে বাড়ি বেচে সব ধারদেনা শোধ করে বাকি টাকায় মফঃস্বলে একটা টু-বেডরুম ফ্ল্যাট কেনা যেতো।"

বেলা মা'র কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে বলে "সত্যি? বাড়ি বেচে এত টাকা পাবো?"

খয়রাতির শাশুড়ি কড়া চোখে খয়রাতির দিকে তাকিয়ে বলে, "প্রপার্টি-ডীলারের কাছে খোঁজ নিতে বলেছিলাম, গিয়েছিলে?"

খয়রাতি চোখ নামিয়ে বলে, "হ্যাঁ।"

"তোমার মা'র বাড়িখানার কত দাম বললো?"

খয়রাতিলাল শাশুড়ির দিকে সোজাসুজি না তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললো, "টাইপ সিক্স ফ্ল্যাট এখন ষাঠ লাখ।"

বেলা বড় একটা হাঁ করলো। তারপর হাঁ বুজিয়ে তালি বাজিয়ে বললো, "ওমা, তাই?"

বেলার মা বললো, "আমি বলছি ও ফ্ল্যাটের দাম সত্তর লাখ। ওরা গ্যারাজ ছাড়াও আবার এক্সট্রা দু'টো রুম নিয়ে সারভেন্টস কোয়ার্টার বানিয়েছে। তার দামই তো দশ লাখ হবে। বাড়ির নাকের ডগায় অত বড় মল, তাতে মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা, রেস্টুরেন্ট, হাল ফ্যাশানের
দোকান-পাট। দু'মিনিট হাঁটলেই মেট্রো স্টেশন। একেবারে পশ্ এলাকা ওটা। তোর শাশুড়ির ফ্ল্যাট এখন প্রাইম প্রপার্টি।"

"হাতে পেলে তবে তো? উনি এখন কবে পটোল তোলেন দ্যাখো!"

খয়রাতি একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে পর মুহূর্তে ঠোঁট কামড়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

এর পর বেয়ানের খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহে রত হলেন বেলার মা। উনি ধুরন্ধর উকিলের মত একটার পর একটা সওয়াল করে যেতে লাগলেন আর খয়রাতি নির্জীব গলায় জবাব দিয়ে গেল।

সওয়াল জবাব সেরে বেলার দিকে চেয়ে বেলার মা বললেন, "বাপ রে, তোর শাশুড়ির পিছনে খরচ কম নয়! দিনে রাতে দু'জন আয়া। তার উপর রান্নার লোক, বাসন মাজা ঝাড়-পোছ ডাস্টিং এসবের জন্যে আলাদা লোক।

সিঁড়ি ঝাঁট, আবর্জনা নিয়ে যাওয়া, হ্যানা ত্যানা করে সোসাইটিকেও গুচ্ছের টাকা দেয়। বিজলি, ফোন, জলের বিল, খাওয়ার খরচ এসব নিয়ে মেরে কেটে হাজার তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা প্রতি মাসে লাগছেই।"

আলোচনার গতিপথ ঠাওর করতে না পেরে খয়রাতি ফস্ করে বলে ফেলে, "তার উপর চিকিৎসার খরচ আছে। রোজ একটা করে ইন্জেকশন লাগছে। ঝাড়া এক বছর ধরে দিতে হবে। এক একটা ইন্জেকশনের দামই চারশো টাকা ---।"

বেলার মা চোখ কপালে তুলে বলে, "ও মা, সে কি? অত টাকা আসে কোত্থেকে? ধার-ধোর করে বসে নেই তো!"

খয়রাতি টাকা ধার করার অন্তর্নিহিত মানেটা হাড়ে হাড়ে বোঝে। নিজের মা'র সম্বন্ধে এই হীনতার ইঙ্গিতে কোথায় যেন বাধে। মাথা নেড়ে বলে, "না না, ধার করতে হয়নি। বাবা মারা যাবার আগে বাড়িটা রিভার্স মর্টগেজে দিয়ে গেছে। ঠিক কত টাকা পায় জানি না, তবে বেশ মোটা টাকা নিশ্চয়ই। বাড়িটার দাম সত্যিই যদি সত্তর লাখ হয়।"

পুরো কথাটা শেষ করার আগেই সে বুঝতে পারে কথাটা বলে সে ভাল করেনি, মারাত্মক রকম ভুল করেছে। বেলা ও বেলার মা ততক্ষণে শোকে-দুঃখে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

বেলার মা বললেন, "ওগো মাগো! ও বাড়ি তার মানে গেছে! আমার বাছাদের কি হবে গো! ওরা যে পথে পথে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে!"

বেলা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলো আওয়াজ করে করে। খয়রাতিকে নির্বাক দেখে বেলার মা উঠে ওর পাশে এসে বসলেন। নীচু মসৃণ গলায় বলতে লাগলেন, "শোনো বাছা, মাথা ঠাণ্ডা করে আমার কথাগুলো ভাল করে শোনো। তোমার তিন তিনটে মেয়ে রয়েছে। তাদের লেখাপড়া শেখানো, ভাল কোনও প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি করানো, ভাল পাত্তর দেখে বিয়ে দেওয়া - এ সবই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার ব্যাপার। এ ছাড়া তোমাদের নিজেদের খরচ আছে। ব্যাঙ্ক থেকে নোটিসের পর নোটিস আসছে। এরপর পেয়াদা আসবে। গাড়ি, আসবাব পত্তর, সব কিছু পাড়াসুদ্ধু লোকের সামনে দিয়ে কেড়ে নিয়ে যাবে। বগল বাজিয়ে দুয়ো দেবে সবাই। গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না তোমাদের। শুধু তোমরা বড়রা নয়, কচি-কাচাগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে মরতে হবে। এর একমাত্র উপায় ওই বাড়িটা। ওটা হাতে পাওয়া চাই-ই। খুব তাড়াতাড়ি।

এক্ষুণি। যত সময় যাবে রিভার্স মর্টগেজের টাকা খেয়ে খেয়ে বাড়ির খাতে টাকা কমতে থাকবে। এদিকে তোমার মা যে রেটে টাকা খরচ করছে, পুরো ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স নিঃশেষ হয়ে যেতেও আর বেশী দেরী নেই নিশ্চয়ই। এত সব করে এক নড়বড়ে বুড়িকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও মানে হয়? ওর জীবনে আছেটা কি? ও কোনদিন সুস্থ হবে ভেবেছ? একটা রোগ সারতে না সারতে আরেকটা ধরবে। তারপর আরেকটা, আবার আরও একটা। ও রকম মানুষ যত তাড়াতাড়ি ইহজীবন থেকে মুক্তি পায় ততই মঙ্গল ----।"

তক্ষুণি ওয়ার্ক-প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল। খয়রাতি গিয়ে মা'র কাছে থাকবে। গভীর রাতে দরজার নাইট-ল্যাচ খুলে দিয়ে স্টাডিরুমে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বে। ইচ্ছে হলে একটা ঘুমের ওষুধ খেতে পারে। এক ঘুমে রাত কাবার করে সকালে উঠে দেখবে যা হবার হয়ে গেছে। রাতে মাকে এক গ্লাস দুধে যে ঘুমের ওষুধের বড়িগুলো মিশিয়ে দেবে, তারই একটা খেলেই হবে। কেউ কিচ্ছুটি টের পাবে না। চারিদিকে খুনখারাপির হিড়িক পড়ে গেছে। ছোরা ছুরি - বন্দুকের গুলি - কেরোসিন তেল ---- নিত্য নতুন উপায়ে বুড়ো মানুষদের ধরে ধরে মারছে রোজ। এখন তো আবার কাগজে দিয়েছে কোন মুলুক থেকে নতুন দল এসেছে। তারা আজ এর মুণ্ডু, কাল ওর মুণ্ডু গুঁড়িয়ে ছাতু করছে। এসব নিয়ে এখন কেউ মাথাও ঘামায় না আর। পুলিশেও হাল ছেড়ে দিয়েছে ----।

- ৩ -

আরও অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে শুয়ে রইলেন লীলাবতী। বাইরে কেউ এসেছে। দরজার ঘণ্টি বাজলো। একবার। আবার একটু বিরতির পর আরও একবার।

কাজের মেয়েটা সকালে মিল্ক বুথ থেকে দুধ এনে দিয়ে যায়। তারপর আর একটু পরে আবার এসে ঝাঁট-পাট, কাপড় কাচা এইসব করে। রাতের ও দিনের জন্যে যে দু'টি মেয়েকে সম্প্রতি রেখেছেন ইদানীং শরীরটা বেশী রকম ভেঙে পড়ার পর, তাদের দু'দিন ছুটি দিয়েছেন। খয়রাতি দু'দিন তাঁর কাছে থাকবে, এ দু'দিন তাদের না এলেও চলে যাবে তাঁর। খয়রাতিই বলেছে তাদের এখন আসতে মানা করে দিতে। পাশের নার্সিং-হোম থেকে আসে মেয়ে দুটো। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা, আবার রাত আটটা থেকে সকাল আটটা। দুই শিফ্‌টে

দু'জন। শিফ্‌ট প্রতি আড়াইশো টাকা। শিফ্‌ট হিসেবে মাইনে। যেদিন আসে না সেদিনকার টাকাটা বেঁচে যায়। দিনে আড়াইশো দু'গুনে পাঁচশো টাকা; দু'দিনে হাজার টাকা। ওমপ্রকাশ বলে গেছেন নিজের শরীর-স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার জন্যে কখনো টাকা পয়সায় হাতটান করবে না। স্বামী যা বলে গেছেন ঠিক সেইভাবেই চলছেন লীলাবতী। শুধু খয়রাতির ব্যাপারটা অন্যরকম। ও যে আসবে সেই সম্ভাবনার কথা কখনো বলেননি ওমপ্রকাশ।

আবার দরজার ঘণ্টা বাজলো। খয়রাতি খুলছে না কেন? এত গাঢ় ঘুম ছেলেটার? অনেক কষ্টে অনেকক্ষণের চেষ্টায় উঠে বসলেন লীলাবতী। বিছানা থেকে নামলেন। তারপর দেয়াল ধরে ধরে দরজার কাছে এলেন। এ কী? দরজা বন্ধ কেন? দরজাটায় তালা মেরে বন্ধ করে গেছে কেউ। বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। এ নির্ঘাৎ খয়রাতির কাজ। কাল ভুলিয়ে ভালিয়ে এ ঘরে এনে তালা মেরে বন্দী করে রেখে গেছে কি মতলবে কে জানে! হঠাৎ গা ছম ছম করে উঠলো তাঁর।

দেয়াল ধরে ধরে জানলার কাছে গিয়ে কাজের মেয়ে দুটোর নাম ধরে ডাক দিলেন,"বাসন্তী! কমলা!"

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না লীলাবতী। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করতে থাকে। বিছানায় এসে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন।

বাইরে অনেক লোকের আওয়াজ। একটা গাড়ি এসে জানলার নীচে রাস্তায় থামলো। আরও একটা গাড়ি। পুলিসের হুইসিল কি? স্টাডিরুমের দরজার তালা ভাঙ্গা হল। জনা পাঁচেক লোক ঘরে ঢুকলো। দু'জন পুলিসের ইউনিফর্ম পরা। কি? কি বলছে ওরা? খয়রাতি নেই। রাত্রে কেউ এসে তার মাথাটা বাড়ি মেরে একেবারে চৌচির করে দিয়েছে। এ.সি. চালিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল খয়রাতি। বালিস বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।